সমরেশ বসু : ১৯২৪-১৯৮৮ খ্রি.

১৯২৪ সালে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সমরেশ বসু। অল্প বয়সেই নৈহাটির নিকটবর্তী আতপুরে চলে আসেন এবং কিছুদিন পর থেকেই নৈহাটির স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। জীবনের শেষ দিকে কলকাতাবাসী হলেও মাঝে মাঝে নৈহাটি চলে যেতেন। ১৯৪৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আদাব' গল্পে তাঁর আবির্ভাবকে স্মরণ করলে বোঝা যায় তিনি কতটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে বাংলা ছোটোগল্পে পা রেখেছিলেন। এর পরে তিনি আরও অনেক ছোটোগল্প লিখেছেন—'অকাল বৃষ্টি', 'ঋতু', 'পশারিণী', 'ফুলবরিয়া', 'উজাপ', 'পাড়ি', 'মানুষ রতন', 'মাসের প্রথম রবিবার' 'কিম্লিস', 'শহীদের মা' ইত্যাদি। 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) সমরেশ বসুর প্রথম উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা', 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'মহাকালের রথের ঘোড়া' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কালকূট' ছদ্মনামে লেখা 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাব তারে', 'শাপ' ইত্যাদি পাঠক সমাজে খুব জনপ্রিয়।

সমরেশ বসুর 'আদাব' : সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানবতার জয়গান

তুফান রায়

সমরেশ বসু ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার রাজনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহিনীমোহন বসু ও মা শৈবলিনী দেবী। সমরেশ বসুর পিতৃদত্ত নাম ছিল সুরথনাথ বসু। পরবর্তীকালে বন্ধু ও শ্যালক দেবশঙ্করের পরামর্শে তিনি সমরেশ নাম গ্রহণ করেন। এছাড়া তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কালকূট' ও 'ভ্রমর'। তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার উপকণ্ঠে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। এরপর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নৈহাটিতে বড়দার রেল কোয়ার্টার্সে এসে মহেন্দ্র উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর নবম শ্রেণিতে আর ওঠেননি। সতেরো বছর বয়সে বন্ধু দেবশঙ্করের স্বামী বিচ্ছিন্না বড়দি গৌরীকে ভালোবেসে নৈহাটি ত্যাগ করে তাকে নিয়ে চলে আসেন আতপুরের বস্তিতে। পরে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর থেকে চার বছরের বড় গৌরী দেবীর সঙ্গে তাঁর আইনসম্মত বিয়ে হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কারামুক্ত হয়ে সাহিত্য রচনাকে জীবিকা

Scanned with CamScanner

হিসেবে বেছে নেন। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসুর আবির্ভাব বিশ শতকের চারের দশকে তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'আদাব'-এর মধ্য দিয়ে। যদিও নিতাই বসু বলেছেন তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শেষ সর্দার'। তাঁর গল্পে অসহায়, সর্বহারা মানুষ বাঁচার অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করে বাঁচতে চায়। তিনি নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন অসহায় মানুষদের আকাঙ্ক্ষা ও তাদের উত্তরণের স্বপ্ন সম্ভাবনাকে ছোটোগল্পে মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১)। তবে তাঁর প্রথম রচিত উপন্যাস 'নয়নপুরের মাটি' পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— 'বি. টি. রোডের ধারে' (১৯৫২ খ্রি.), 'শ্রীমতী কাফে' (১৯৫৭ খ্রি.), 'গঙ্গা' (১৯৫৭ খ্রি.), 'বিবর' (১৯৬৫ খ্রি.), 'প্রজাপতি' (১৯৬৭ খ্রি.), 'মহাকালের রথের ঘোড়া' (১৯৭৭ খ্রি.), 'শেকড় ছেঁড়া হাতের খোঁজে' (১৯৮৪ খ্রি.) ইত্যাদি। আর সমরেশ বসুর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩ খ্রি.), 'অকাল বৃষ্টি' (১৯৫৩ খ্রি.), 'মনোমুকুর' (১৯৫৮ খ্রি.), 'ছেঁড়া তমসুক' (১৯৭১ খ্রি.), 'কামনা বাসনা' (১৯৭২ খ্রি.) ইত্যাদি। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটোগল্পগুলি হল— 'আদাব', 'কিমলিস্', 'আইন নেই', 'প্রতিরোধ', 'ছেঁড়া তমসুক', 'শহীদের মা' ইত্যাদি।

॥ ২ ॥

সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি ১৯৪৬ সালে মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি তাঁর প্রথম গল্প সংকলন গ্রন্থ 'মরশুমের একদিন' (১৯৫৩ খ্রি.)-এর শেষতম গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছিল।

১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন হিন্দুপ্রধান ভারত ও মুসলমান প্রধান পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিকল্প প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে এবং একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে মুসলিম লিগ ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক দেয়। এই প্রতিবাদ আন্দোলন থেকেই কলকাতায় হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় এবং ক্রমশ তা সমগ্র ভারত তথা সমগ্র রাজ্যে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে আর হিন্দু-মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন পারস্পরিক প্রবল অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঘৃণা, আক্রোশ, হিংসা। আর ১৯৪৬ সালের এই রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা 'আদাব' গল্পটি শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ মানবতার গল্প।

॥ ৩ ॥

লেখক হিন্দু আর মুসলমানের বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের সূত্রপাত করেছেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের দা, লাঠি, সড়কি, ছুরি নিয়ে মুখোমুখি লড়াই, গুপ্ত ঘাতকের দলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আর এই সুযোগে লুঠেরাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়া, বস্তিতে বস্তিতে আগুন, মৃত্যুকাতর নারী ও শিশুর চিৎকার পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকের ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আইন-শৃঙ্খলা বজায়

Scanned with CamScanner

রাখতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ এসবের বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক গল্পের শুরুতেই দাঙ্গার বিভীষিকাময় পরিবেশকে তুলে ধরেছেন। আর এরকম বিভীষিকাময় পরিবেশে প্রাণভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত একজন লোক দুটি গলির মিলনস্থলে রাখা ডাস্টবিনের আড়ালে এসে আশ্রয় নেয়—নির্জীবের মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ ডাস্টবিনটা নড়ে উঠলে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয় ভয়ংকর কিছু ঘটার প্রতীক্ষায়। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না আর পুনরায় ডাস্টবিনটা নড়ে উঠলে মাথা তুলে দেখতে গিয়ে তার চোখে পড়ল আর একটা মাথা—তার মতই একটা লোক, সে ডাস্টবিনের অপর প্রান্তে আত্মগোপন করেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্রান্তিকালে তারা পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং যখন কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না তখন তারা পরস্পরের জাতি ও ধর্ম পরিচয় জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তারপর তাদের পরিচয় হয় পেশা দিয়ে—একজনের বাড়ি 'নারাইন গঞ্জের' কাছে চাষাড়ায়, সে সুতাকলের মজুর অপরজনের বাড়ি বুড়িগঙ্গার ওপারে 'সুবইডায়', সে নৌকার মাঝি। এমন সময় কাছাকাছি একটা শোরগোল উঠলে দু'জনেই পুনরায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে, তারপর সন্দেহের মেঘকে সরিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। তাই সুতাকলের মজুর মাঝিকে বলে— "তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?"[১] এরপর বিড়ি খাওয়ার সূত্রে নৌকার মাঝির 'সোহান্ আল্লা' উচ্চারণে সুতাকলের মজুর বুঝতে পারে মাঝি মুসলমান আর সুতাকলের মজুরের সঙ্গে কথোপকথনে মাঝিরও জানা হয়ে যায় যে সুতাকলের মজুর হিন্দু। এই ধর্ম পরিচয় প্রকাশের পর দু'জনের মনে পুনরায় সন্দেহ জাগলেও অচিরেই তা দূর হয়ে যায়। তারপর তারা দাঙ্গার কারণ এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করে এবং তারা দু'জনেই দাঙ্গার এই রক্তক্ষয়ী পরিণামকে ঘৃণা করে। তাই নৌকার মাঝি বলেছে—"আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?"[২] এরকম ব্যক্তিগত আলোচনার মাঝে আচমকা ব্রিটিশ শাসকের টহলদারি পুলিশদের ভারি বুটের শব্দে তারা শঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালাতে পালাতে একসময় তারা মুসলমান প্রধান এলাকা ইসলামপুর ফাঁড়ির কাছে চলে আসে। তখন নৌকার মাঝি সুতাকলের মজুরকে বলে—

> তাই কইতেছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। ...এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইব গা।"

এরপর মাঝি ইস্‌লামপুর দিয়ে বুড়ি গঙ্গা পার হয়ে তখনই চলে যেতে চায় বাড়িতে—কেননা আগামী দিন ঈদ এবং সেই উপলক্ষে মাঝি ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীর জন্য জামা ও শাড়ি কিনেছে এবং তারাও মাঝির ফেরার অপেক্ষায় ব্যাকুল হয়ে বসে আছে। ভাবী বিপদের কথা ভেবে সুতাকলের মজুর মাঝিকে যেতে বারণ করলেও মাঝি তাকে আশ্বস্ত করে এবং তারা পরস্পরকে সৌজন্যমূলক 'আদাব' জানায় ও মাঝি বিদায় নেয়। এরপর সুতাকলের মজুর ভাবতে থাকে মাঝি বাড়ি ফিরলে ছেলে-মেয়ের আনন্দের কথা এবং তার স্ত্রীর সোহাগের কথা। কিন্তু আচমকা অশ্বারোহী পুলিশ অফিসারের রিভালবার চালানোর শব্দে সুতাকলের মজুর আৎকে ওঠে

Scanned with CamScanner

কেননা পুলিশ অফিসার ডাকাত ভেবে কাউকে গুলি করেছে। আর তখনই আতঙ্কগ্রস্ত সুতাকলের মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে ওঠে মাঝির রক্তাক্ত দেহ। সে যেন তাকে বলছে, ভাই শত্রুরা ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীর কাছে তাকে যেতে দিল না এবং উৎসবের দিনে তারা আনন্দের পরিবর্তে দুঃখের কাল সলিলে ডুবে যাবে। এভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সাধারণ মানুষের জীবনে কী ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আসে—লেখক এই গল্পের সংক্ষিপ্ত কাহিনির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

॥ ৪ ॥

সাহিত্যের যে কোন শাখায় নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সাহিত্যের নামকরণের মধ্য দিয়ে আমরা তার কেন্দ্রীয় বক্তব্য সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। সাহিত্যে নামকরণের তিনটি রীতি আছে—বিষয়কেন্দ্রিক, চরিত্রকেন্দ্রিক এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। আমাদের আলোচ্য 'আদাব' গল্পটির নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী। আর এই 'আদাব' শব্দের অর্থ 'নমস্কার' এবং 'সেলাম'। সাধারণত মুসলমানরা সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রকাশে 'আদাব' শব্দের ব্যবহার করে আর হিন্দুরা করে 'নমস্কার' শব্দের ব্যবহার সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রকাশে।

গল্পটি হিন্দু ও মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে এক হিন্দু সুতাকলের মজুর ও এক মুসলমান নৌকার মাঝির মানবিকতার কাহিনি হয়ে উঠেছে। দাঙ্গার বিভীষিকাময় পরিবেশে দুটি গলির মিলনস্থলে এক ডাস্টবিনের পাশে তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। প্রথমে তারা পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখলেও ক্রমে তাদের মধ্যে জাত-পাতের উর্ধ্বে মানবিক সম্পর্ক বড় হয়ে ওঠে। তাদের কথোপকথনে উঠে আসে দাঙ্গার ভয়াবহ পরিণতির কথা এবং সেই সূত্রে তাদের পারিবারিক জীবনের দুর্গতির কথা। দাঙ্গার এই বিভীষিকাময় পরিবেশে তারা পরস্পরকে আগলে রাখতে চায়। টহলদার পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা দু'জনে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং ইস্‌লামপুর ফাঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়ে নৌকার মাঝি সুতাকলের মজুরকে সেখানে রাত্রিটুকু অপেক্ষা করে সকালে উঠে বাড়ি চলে যেতে বলে। কেননা ইসলামপুর মুসলমান প্রধান এলাকা হওয়ায় দাঙ্গার এই পরিবেশে হিন্দু সুতাকলের মজুরের সেখানে বিপদ হতে পারে—এই আশঙ্কায় মাঝি তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করে। আর মাঝি মুসলমান হওয়ায় মুসলমান প্রধান এলাকা দিয়ে কোনক্রমে বুড়িগঙ্গা পার হলেই বাড়ি চলে যেতে পারবে, কেননা বাড়ি তাকে যেতেই হবে—আগামী দিন ঈদ উপলক্ষে তার ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রী অধীর অপেক্ষায় তার জন্য বসে আছে বলে। তাই সে চলে যেতে চায়, কিন্তু এরকম দিনে যেকোন এলাকায় যেকোন ধর্মের মানুষেরই বিপদ হতে পারে—এই আশঙ্কায় সুতাকলের মজুর নৌকার মাঝিকে বাধা দিয়ে বলেছে—

> আরে না না মিয়া করো কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, অ্যাঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।"

কিন্তু মাঝি পরিবার পরিজনের কথা বলে সুতাকলের মজুরের নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিদায় নেওয়ার সময় সুতাকলের মজুরকে আন্তরিকতার সঙ্গে আশ্বস্ত করে বলেছে—

Scanned with CamScanner

পারব না ধরতে ডরাইয়ো না। এইখানে থাইকো, য্যান উইঠো না। যাই... ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লাগে মোলাকাত হইব।—আদাব।[৫]

আর তখন সৌজন্য ও শিষ্টাচার হিসেবে সুতাকলের মজুরও বলে—

"—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।"[৬] এবং মাঝি বিদায় নেওয়ার পর সুতাকলের মজুর প্রার্থনা করেছে—"... ভগমান—মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।"[৭]

প্রকৃতপক্ষে 'আদাব' গল্পটি হল অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ মানবতার গল্প। আর গল্পের মাঝি যখন সুতাকলের মজুরের কাছে বিদায় নেয় তখন সে সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রকাশে সুতাকলের মজুরকে 'আদাব' জানিয়েছে আবার মাঝির প্রতি সৌজন্য ও শিষ্টাচার প্রকাশে সুতাকলের মজুরও 'আদাব' শব্দটির ব্যবহার করেছে। লক্ষণীয় এই মুহূর্তে সুতাকলের মজুর হিন্দু হয়েও 'আদাব' শব্দটি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মুসলমান মাঝির সঙ্গে এক হয়ে গেছে মানবিক সম্পর্কের সূত্রে— সেই মুহূর্তে তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই চিরন্তন পরিচয়। আর গল্পের মূল বক্তব্য—মানবিক বোধের প্রকাশে 'আদাব' নামকরণ ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে শিল্প সম্মত হয়ে উঠেছে।

॥ ৫ ॥

ছোটোগল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান চরিত্র—এই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই লেখক তাঁর মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেন। আলোচ্য 'আদাব' গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র—সুতাকলের মজুর এবং নৌকার মাঝি। তাদের স্বতন্ত্র কোন নাম নেই। তাদের পরিচয় পেশা দিয়ে। আসলে তাদেরকে লেখক হিন্দু ও মুসলমান-দুই ধর্মের প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন, যারা ভিন্ন ধর্মের হলেও মানবিক সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। বস্তুত সাধারণ মানুষ যে দাঙ্গা চায় না, দাঙ্গা বাঁধায় কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ—তা লেখক এই দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বহুদিন ধরে হিন্দু ও মুসলমানরা যে ভাইয়ের মত একসঙ্গে একাত্ম হয়ে থেকেছে এবং আজীবন থাকতে চায়—এই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে—এই দুটি চরিত্রের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে।

দাঙ্গার বিভীষিকাময় পরিবেশে অপরিচিত দুটি চরিত্রের প্রথম যখন সাক্ষাৎ ঘটে তখন তারা পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখে—তারা পরস্পরের ধর্ম পরিচয় জানতে চায়। যেমন—

একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু না মুসলমান? —আগে তুমি কও। অপর লোকটি জাবাব দেয়। পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ।[৮]

তবে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ক্রমশ তাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং তখন আচমকা তাদের ধর্ম পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেলেও তা নিয়ে তারা আর পূর্বের ন্যায় খুব বেশি চিন্তিত হয় না। কেননা তখন তাদের মধ্যে মানবিক সম্পর্কটাই বড় হয়ে উঠেছে। তাই মাঝি ঈদ উপলক্ষে ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীর প্রতীক্ষার কথা ভেবে বাড়ি ফেরার জন্য সুতাকলের মজুরকে ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে সুতাকলের মজুরকে সাবধানে থাকতে বলে যায় এবং মাঝি বিদায় নেওয়ার পরে সুতা মজুর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, মাঝি যেন বিপদে না পড়ে। অর্থাৎ গল্পের শেষে মাঝি ও

Scanned with CamScanner

সুতাকলের মজুর ভিন্ন ধর্মের লোক হলেও পরস্পরের মঙ্গল কামনা করেছে। আবার দুটি চরিত্রই কথোপকথনে নিজ ধর্মসূত্রে 'ভগবান' ও 'আল্লা' বলেছে। কিন্তু মাঝি বিদায় নেওয়ার সময় মুসলমান হওয়ায় সৌজন্য ও শিষ্টাচার হিসেবে 'আদাব' বললে প্রত্যুত্তরে সুতাকলের মজুর হিন্দু হয়ে সৌজন্য ও শিষ্টাচার হিসেবে কিন্তু 'নমস্কার' বলেনি, বলেছে 'আদাব'।

আসলে বিভিন্ন ঘটনার সাপেক্ষে চরিত্র দুটির এই যে বিবর্তন লেখক দেখিয়েছেন, তা গল্পের মূল বক্তব্য—মানবিকতার প্রকাশ ও পরিণতিকে সার্থক করে তুলেছে এবং চরিত্র দুটিও বাস্তব সম্মত মানবিক চরিত্র হয়ে উঠেছে।

॥ ৬ ॥

১৯৪৬ সালের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা 'আদাব' গল্পে লেখক সমকালীন হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, সন্দেহ, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি প্রভৃতি প্রসঙ্গকে অসাধারণ শিল্প সংযমে এড়িয়ে গেছেন এবং হিন্দু সুতাকলের মজুর ও মুসলমান নৌকার মাঝির পারস্পরিক হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব ও মানবিক সম্পর্ককে বড় করে দেখিয়েছেন। তাদের প্রথম এবং শেষ পরিচয় তারা মানুষ এবং এই সম্পর্কেই তারা বাঁচতে চায়। তাই তাদের ধর্ম পরিচয় ভিন্ন হলেও তারা পরস্পরের বন্ধু হয়, পরস্পরকে সাবধান করে এবং পরস্পরের জন্য চিন্তিত হয়। তাই অন্ধ সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে তারা ভালো চোখে দেখেনি, বরং ব্যথিত হয়েছে। তাই মাঝি যখন দাঙ্গার নিষ্ফলতা ও ভয়াবহতা সম্পর্কে মানবিক প্রশ্ন তোলে তখন সুতা মজুর সায় দিয়ে বলেছে—

> আরে আমিও ত হেই কথাই কই। হইব আর কী, ...তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইবে।[৯]

আর মাঝি এই অমানবিক হানাহানি সহ্য করতে না পেরে নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়ে—

> মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেম্‌বায়?[১০]

আবার পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা একসঙ্গে অন্যত্র চলে গিয়েছে গোপনে। আর মুসলমান প্রধান এলাকা ইসলামপুরে গেলে হিন্দু সুতা মজুরের বিপদ হতে পারে বলে মাঝি তাকে সেখানে যেতে বারণ করেছে এবং মাঝি দাঙ্গার এই পরিবেশে একাকী বাড়ি ফিরতে চাইলে তারও বিপদ হতে পারে—এই আশঙ্কায় সুতা মজুর তাকেও যেতে বারণ করেছে। আর গল্পের শেষে মাঝি সুতা মজুরের কাছে বিদায় নেওয়ার সময় 'আদাব' বললে হিন্দু সুতা মজুরও মুসলমান মাঝির সঙ্গে মানবিকতার সম্পর্কে এক হয়ে গিয়ে 'আদাব' বলেছে। আবার মাঝি বিদায় নেওয়ার পর তার যেন কোন বিপদ না হয় সেজন্য সুতা মজুর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে। আর এসব কিছুই আসলে বিশুদ্ধ মানবতারই প্রকাশ। এভাবে গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক সমরেশ বসু গল্পের মূল বার্তা বা বক্তব্য তথা প্রতীতিজাত সমগ্রতা-জাত-পাত ও অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যে বিশুদ্ধ মানবপ্রেম তাকেই সুনিপুণ শিল্প সংযমে ব্যক্ত করেছেন।

Scanned with CamScanner

॥ ৭ ॥

সবশেষে আমরা 'আদাব' গল্পটি ছোটোগল্প হিসেবে কতটা শিল্পসম্মত হয়েছে— তা আলোচনা করব। আর 'আদাব' গল্পটির শিল্প সার্থকতা আলোচনার পূর্বে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক—

একটি সার্থক ছোটোগল্পে থাকে কাহিনি বা ঘটনার একমুখীনতা, আরম্ভের তির্যকতা, নাটকীয়তা, Climax বা রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, ক্ষুদ্র পরিধিতে স্বল্পসংখ্যক চরিত্র, বাস্তবতা এবং সমাপ্তিতে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা। এবার এইসব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে 'আদাব' গল্পটির শিল্প সার্থকতা বিচার করা যাক।

'আদাব' গল্পটি বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের গল্প। গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুতাকলের মজুর ও মাঝির পারস্পরিক ব্যবহারে জাত-পাত, ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবিক সম্পর্কই বড় হয়ে উঠেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে লেখক এই গল্পে দাঙ্গাকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে অন্তঃশীল বয়ে চলা হিংসা, ঘৃণা, ভয়, সন্দেহ ইত্যাদি বৃত্তিগুলি এবং সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও অসম্ভব শিল্প-সংযমে তাকে এড়িয়ে গিয়ে কাহিনির গতিকে বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছেন।

গল্পটি দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা হওয়ায় দাঙ্গাকালীন পরিস্থিতির তির্যক বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পটি শুরু করেছেন লেখক—

> রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল। শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই, দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে।[১১]

গল্পের শুরুতেই দাঙ্গার ভয়াবহতাকে লেখক এভাবে তির্যক বর্ণনার মধ্য দিয়ে আকস্মিকভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

'আদাব' গল্পের সুতাকলের মজুর ও মাঝির কথোপকথনে, উত্তেজনাময় পরিস্থিতির বর্ণনায় নাটকীয়তা আছে। যেমন—

> হলট্...ধ্বক্ করে উঠল সুতা মজুরের বুক, বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে। ...সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভালবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।
>
> ...উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে।[১২]

আর এসব রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির বর্ণনা গল্পের কাহিনিতে নাট্যরসের স্বাদ এনে দিয়েছে 'আদাব' গল্পে মাঝির বিদায় নেওয়ার পরের মুহূর্তে সুতাকলের মজুরের মাঝিকে ঘিরে বাসনা ও বাস্তবতার মধ্যে যে বৈপরীত্য লেখক সৃষ্টি করেছেন সেখানেই গল্পের Climax বা রুদ্ধশ্বাস

Scanned with CamScanner

অবস্থার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। যেমন, মাঝি বিদায় নিলে সুতাকলের মজুর মাঝির সঙ্গে তার বিবির মধুর মিলনের কথা বলেছে—

> মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ? সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন।[১৩]

কিন্তু আচমকা পুলিশ অফিসারের 'হলট্' শব্দ উচ্চারণে সুতাকলের মজুরের সেই মিলন ভাবনায় ছেদ পড়ে, আতঙ্কে 'ধ্বক্' করে ওঠে তার বুক। কেননা সে পুলিশ অফিসারের রিভালবার চালানোর শব্দ এবং কোন মানুষের মরণ আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে।

আলোচ্য গল্পটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং এর দুটি মাত্র প্রধান চরিত্র। আর এই নির্ভার, নির্মেদ কাহিনির সংক্ষিপ্ত পরিসরেই লেখক চরিত্র দুটির বিবর্তন দেখিয়েছেন। প্রথমে তারা ছিল পরস্পরের প্রতি সন্দিহান, কিন্তু পরে পারস্পরিক ব্যবহারে তারা একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে —'তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?'[১৪] এবং পরস্পরের বিপদের কথা ভেবে পরস্পরকে সাবধান করে তারা। শেষে বিদায় মুহূর্তে সৌজন্য ও শিষ্টাচার হিসেবে 'আদাব' বিনিময়ের মধ্য দিয়ে চরিত্র দুটির মানবিক অনুভূতিই বড় হয়ে উঠেছে।

'আদাব' গল্পে লেখক ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাককে কেন্দ্র করে যে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল সেই প্রসঙ্গের উত্থাপনে, চরিত্রদের সংলাপে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ব্যবহারে এবং ইসলামপুর ফাঁড়ি, বুড়িগঙ্গা, নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া পার্ক, মিলিটারি টহলদার গাড়ি, রায়টের প্রসঙ্গ প্রভৃতির উত্থাপনে গল্পটিকে কঠিন বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

আলোচ্য গল্পের শেষে রয়েছে অতৃপ্তি বা রহস্যময়তার ব্যঞ্জনা। গল্পের শেষে মাঝি বিদায় নেওয়ার পর কিছু সময় কেটে গেলে সুতাকলের মজুর ভাবে এতক্ষণে মাঝি হয়তো বাড়ি চলে গেছে এবং তার ভাবনায় দৃশ্যমান হয় মাঝি ও তার বিবির মধুর মিলনের ছবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসার 'ডাকু' ভেবে কাউকে গুলি করলে এবং তার আর্তনাদ শুনতে পেয়ে সুতাকলের মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠেছে মাঝির রক্তাক্ত দেহ। মাঝি যেন তাকে বলছে—

> পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।[১৫]

এখন প্রশ্ন মাঝি কি পুলিশ অফিসারের গুলিতে সত্যিই নিহত হয়েছে? তবে তা কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি না। কেননা সুতাকলের মজুর মাঝি চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে পুলিশ অফিসারের গুলি চালানোর শব্দ এবং জনৈক ব্যক্তির সেই গুলিতে বিদ্ধ হওয়ার মরণ আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে। এ বিষয়ে অতৃপ্তি বা রহস্যের ব্যঞ্জনা থেকেই যাচ্ছে আবার সত্যিই মাঝি যদি মারা যায় তবে তার পরিবারের কী অবস্থা হল শেষ

Scanned with CamScanner

পর্যন্ত সে সম্পর্কেও আমাদের একটা কৌতূহল থেকে যাচ্ছে। এভাবেই অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে গল্পের ইতি টেনেছেন লেখক।

এভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করে দেখলাম ছোটোগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পটি একটি সার্থক শিল্প সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

উৎসের সন্ধানে

১. সমরেশ বসু রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৯৭, অষ্টম মুদ্রণ জুন ২০১৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭০০ ০০৯, পৃ. ৫৩৩

২. তদেব, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫

৩. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৪. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৫. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৬. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৭. তদেব, পৃ. ৫৩৬

৮. তদেব, পৃ. ৫৩৩

৯. তদেব, পৃ. ৫৩৫

১০. তদেব, পৃ. ৫৩৫

১১. তদেব, পৃ. ৫৩২

১২. তদেব, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭

১৩. তদেব, পৃ. ৫৩৬

১৪. তদেব, পৃ. ৫৩৩

১৫. তদেব, পৃ. ৫৩৭

Scanned with CamScanner